নিউইয়র্ক শহরে

শোভন শামস্

আমেরিকাতে বেড়ানোর জন্য ছোটভাই স্পন্সর করল। সেই অনুযায়ী আবিদজানে অবস্থানকালীন প্রস্তুতি নিলাম আমেরিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার । আল্লাহর অশেষ রহমতে অবশেষে ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৫ যাত্রা করলাম আমেরিকার নিউইয়কের উদ্দেশ্যে । সেপ্টেম্বরের ৪/৫ তারিখ আবিদজানের সাতগুরু ট্রাভেলসে গিয়ে টিকেট করে এলাম। এয়ার লাইন্সের নাম রয়েল এয়ার মরক। সব মিলিয়ে ৫,৫০,০০০.০০ সিএফএ লাগল, প্রায় ১০০০ ডলার। আবিদজান টু কাসাব্লাংকা, সেখান থেকে নিউইয়র্ক জন এফ কেনেডি বিমান বন্দর এবং ফেরত । ফেরার পথে কাসাব্লাংকাতে একদিন হোটেলসহ থাকার ব্যবস্থা। ১৪ তারিখ রাত একটা পচিঁশ মিনিটের ফ্লাইট, রাত ৯ টার পর এয়ারপোর্টে এলাম। চেক ইনের জন্য আরো দুই ঘন্টা । আমি একা দাড়িয়ে থাকলাম আবিদজান এয়ারপোর্টে । বসার ব্যবস্থা নেই । রাত দশটা পঁচিশ এর দিকে চেকইন করলাম । টার্মিনালের ভিতর গেলাম। ওয়েটিং এরিয়াতে প্রায় রাত বারটা চল্লিশ পর্যন্ত বসে ছিলাম সব চুপচাপ শান্ত নতুন একটা মহাদেশে প্রথম যাচ্ছি । প্লেনে করিডোরের পাশে সিট ।৩ সিটে ২ জন বসেছি একটা খালি । প্লেন টেকঅফের পর প্রথমে জুস দিল , তারপর রাতের খাবার, ডিম, মার্মলেড, আলু সেদ্ধ , ব্রেড ইত্যাদি। খারাপ লাগেনি ।

৪ ঘন্টা ১০ মিনিট ফ্লাইট শেষে কাসাব্লাংকা পঞ্চম মোহাম্মদ আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্টে প্লেন ল্যান্ড করল। তখন সময় সকাল ৬ টা । প্লেন থেকে নেমে বাসেকরে টার্মিনাল ও ট্রানজিট লাউঞ্জে এলাম। সকালের ফযরের নামাজ পড়লাম, নামাজের জন্য আলাদা জায়গা আছে এয়ারপোর্টে । ৯ টার পর চেক ইন হবে। তেমন কোন কাজ নেই কোথাও যাওয়ার ও নেই। ডিউটি ফ্রি সপগুলোর সামনে বসে বসে সময় কাটালাম, কিছু কিনতে ইচ্ছে করল না । ১০ টার দিকে বোর্ডিং কার্ড নিয়ে বোর্ডিং এরিয়াতে গেলাম। হ্যান্ড লাগেজ সব চেক করল, রেজর রেখে দিল, নেয়ার নিয়ম নেই । প্লেনটা সুন্দর, নতুন বোয়িং ৭০৭। আমি ভাল সিট পেলাম তাই পা ছড়িয়ে বসলাম। পাশের সিটের যাত্রীর নাম মোহাম্মদ, মরক্কোর অধিবাসী। এখন ইউএস সিটিজেন, ফ্লোরিডাতে ব্যবসা করে। ১১-৩০এ প্লেন টেক অফ করল, এরপর আটলান্টিক মহাসাগর। কুলকিনারা ছাড়া ৭ ঘন্টা ফ্লাইট। একমাত্র আল্লাহই এই অবস্থায় হেফাজত করেন। টানা জার্নি বেশ কস্ট। ২ বার খাবার দিল । ডিনার ছিল মাংশ, অল্প ভাত, ভেজিটেবল, স্প্রাইট ও জুস, ভাল ভাবেই খেলাম । নিউইয়র্ক সময় বিকাল ৩ টায় জন এফ কেনেডি বিমান বন্দরে প্লেন ল্যান্ড করল ।

নিউ ইয়র্ক শহরের কথা ভাবলেই ষ্টাচু অব লিবার্টির ছবি মনে ভেসে উঠে । এটা আমেরিকার প্রাচুর্য এবং সুযোগের কথা ইমিগ্রান্ট এবং পর্যটকদের মনে করিয়ে দেয় । ইটালিয়ান পর্যটক জিওভানি ডি ভেরাজানো প্রথম ইউরোপিয়ান, যে ১৫২৪ সালে বর্তমান নিউ ইয়র্ক এলাকায় আসেন । তারো অনেক পরে ১৬০৯ সালে হেনরি হাডসন আসার পর কলোনাইজেশন সুরু হয় । হেনরি হাডসন চীন যাওয়ার পথ আবিষ্কার করতে গিয়ে নিউ ইয়র্কে চলে আসেন । অনেক উত্থান পতন এবং দ্বিতীয় এ্যাংলো ডাচ যুদ্ধের পর ১৬৮৫ সালে ডিউক অব ইয়র্ক এর নামানুসারে এই জায়গাটা নিউ ইয়র্ক নামকরন করা হয় এবং তা একটা ব্রিটিশ ক্রাউন কলোনীতে পরিণত হয় । প্রথমে ইমিগ্রেশন ফরমালিটিজ । ৩ নং গেটে গেলাম, লাইনে ১০/১২ মিনিট দাঁড়ানোর পর ইমিগ্রেশন অফিসারের সামনে এলাম, স্পেনিশ বংশোদ্ভুত বলে মনে হলো। পাসপোর্ট দিলাম, সাথে আই-৯৪, অবতরণ কার্ড ও আইডি দেখালাম। বলল কোথায় এসেছি, বললাম ভাইকে দেখতে । ডান ও বাম হাতের আংগুলের ছাপ নিল, ক্যামেরার দিকে তাকাতে হলো। জিজ্ঞাসা করল কতদিন থাকব ? বললাম সেপ্টেম্বরের ২৮ পর্যন্ত। ৬ মাসের ভিসার সীল মেরে দিল। খুব সহজে পার হলাম । এরপর নাথিং টু ডিকলার লাইন দিয়ে বের হয়ে গেলাম । ওয়েটিং এরিয়াতে আসার আগে লাগেজ কালেকশন করলাম। ওয়েটিং এরিয়া থেকে সিটি ম্যাপগুলো নিলাম । এখানে র‍্যাকে পর্যটকদের জন্য ফ্রি বুকলেট ও ম্যাপ সাজানো আছে । তারপর ১ ঘন্টার বেশী অপেক্ষা।

ওয়েটিং এরিয়ার লোহার বেঞ্চে বসেছিলাম ,এসি আছে কাজেই কোন সমস্যা নেই। ৪-২০ এর দিকে দেখি ছোটভাইরে বড় ছেলে চাচ্চু বলে দৌড়ে এলো । ওকে আদর করে কোলে নিলাম ও খুব খুশী । বাইরে এলাম । ছোটভাই প্রথমে আমাকে খুজে পায়নি তাই গাড়ী পার্কিংএ রেখে এসেছে । ছোট ভাই গাড়ী চালাচ্ছিল। সুন্দর গাড়ী, ২০/৩০ মিনিট ড্রাইভ করে জ্যাকশনহাইটে ওর বাসায় আসলাম । জ্যাকশন হাইট হলো বাংলাদেশীদের আস্তানা। এর কাছেই কুইন্সে ভাইয়ের বাসা । নিউইয়র্কে ৫ টা বরো বা এলাকা আছে, কুইন্স তাদের একটা । ম্যানহাটান , ব্রুকলিন, ব্রুনক্স এগুলো ভিন্ন বরো। ছোট ভাই আমাকে ব্রুনক্স থেকে দুরে থাকতে বলল। বাকী জায়গা গুলোতে মোটামুটি নিরাপদে ঘুরতে পারি । ব্রুনস্ক কালোদের এলাকা ,সস্তা এলাকা কিন্তু এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা বেশী ভাল না, তাই না যাওয়া উত্তম, ১৫ দিন নিউইয়র্ক অবস্থানকালীন সেখানে যাইনি কখনো । আমেরিকার ৫১ টা ষ্টেট ঘুরে দেখা এক জীবনে সম্ভব কিনা জানি না তবে ৪০ ভাগ আমেরিকান তাদের জীবনে নিজের এলাকা ছেড়ে বাইরে কখনও যায়নি ।

এপার্টমেন্টটা বেশ সুন্দর । ডিম, মুরগীরান্না, ফ্রাই চপ পোলাউ, রাশান সালাদ রান্না হয়েছে । ভালই লাগল। রাতে আর কোথাও যাইনি ঘরে বসে সময় কাটালাম। একটু গরম আবহাওয়া, ফ্যান এ কাজ হচ্ছে না। ওদের লিভিংরুমে থাকার ব্যবস্থা । রাত ১ টার দিকে ঘুম দিলাম। সকালে ঘুম

থেকে উঠে সিরিয়াল দিয়ে নাস্তা খেলাম তারপর বাচ্চাদেরকে স্কুলে দিয়ে এলাম। সব বিভিন্ন জাতির লোকজন। কাজেই জাতিগত বা বর্ণগত কোন সমস্যা নেই। এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা, চীন ইউরোপ সব দেশের লোকজনের বাচ্চা এখানে আছে । মা বা বাবা সাথে নিয়ে আসছে । টিচাররা ভেতরে নিয়ে যাচ্ছে বাচ্চাদের। দুর্গের মত স্কুল, ছাত্ররা ছাড়া কেউ ভেতরে যেতে পারে না। বৃষ্টি ছিল, ছাতা নিয়ে ঘুরলাম কিছুক্ষণ, ৯ টায় ফেরৎ এলাম বাসায় ১০ টায় আশে পাশের ২/৩ কিঃ মিঃ এলাকার বিভিন্ন দোকান পাটে ঘুরলাম। রাতে সবাই মিলে আইসক্রিম কিনতে ডিপার্টমেন্টার স্টোরে গেলাম।

জেসি পেনি ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর

পরদিন শুক্রবার নাস্তাকরে বাচ্চাদের স্কুলে দিয়ে ১০ টার দিকে বের হলাম । আজ বহুদুর হেঁটে টার্গেট, জেসি পেনি ইত্যাদি ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোরে ঘুরলাম । এখানে সবকিছুর দাম বেশী তবে কোয়ালিটি প্রোডাক্ট। প্রায় ২/৩ ঘন্টা হাটলাম। ৫/৬ টা ছোট বড় ষ্টোরে ঢুকলাম তবে তেমন কোন জিনিষ কেনা হলো না। একটায় জুম্মার নামাজ পড়তে গেলাম । " কুইন্স " এর বাংগালী মসজিদে । ২ টার মধ্যে নামাজ শেষ হলো । মিলাদ পড়লাম, তবারক বাসায় নিয়ে এলাম। সিংগারা ও লাড্ডু । রাতে বাসার চারপাশের এলাকা ঘুরলাম , বহু দিন পড়ে দুই ভাই গল্প করে সময় কাটালাম । এখানকার ব্যবসার প্রসপেক্ট সম্বন্ধে অনেক কথা হলো ।

দুপুর বেলা নিউইয়র্ক ম্যানহাটনের কাছে নদীর পাড়ে গেলাম । টিউবে করে মানহ্যাটানের বিভিন্ন জায়গা ঘোরাফেরা করলাম । আবার ম্যানহাটানের টাইম স্কোয়ার বেশ প্রসিদ্ধ জায়গা অনেক নাম শুনেছি আজ নিজ চোখে দেখলাম । এখানে ছবি তোলার অনেক ইচ্ছে ছিল কিন্তু তোলা হলো না । রাস্তা গুলোতে সারি সারি গাড়ি চলছে । আকাশচুম্বী সব ভবন । আকাশের দিকে সোজা তাকাতে গেলে ঘাড় ভেংগে যাওয়ার অবস্থা । কর্নারগুলোতে কফিশপ ও বসার ব্যবস্থা আছে । পর্যটকরাই মূলত সেখানে কফি পানও বেড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে আড্ডায় মশগুল ।

টাইম স্কোয়ার

৪২ স্ট্রীট ষ্টেশনে নামলেই টাইম স্কোয়ার এলাকা । ১৯২০ সালে নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকার হেড অফিস এখানে স্থাপন করা হয় এবং এই নামটি সেখান থেকে আসে । হাজার হাজার নিয়ন সাইনে টাইম স্কোয়ার আলোকিত এবং রাতের নিউ ইয়র্কের একটি দর্শনীয় জায়গা এই স্কোয়ার । রেকটর স্ট্রীট সাবওয়ে ষ্টেশন থেকে ওয়াল স্ট্রীটে যাওয়া যায় । এটা নিউইয়র্কের অর্থনৈতিক প্রানকেন্দ্র, এর পশ্চিম কোনায় ট্রিনিটি চার্চ আছে । চার্চের সামনে একটুখানি জায়গা সেখানে বসার ও ব্যবস্থা আছে । ১৮৪৬ সালে অ্যাংগলিকান চার্চের কতিপয় সদস্য গোথিক স্থাপত্যকলায় এই চার্চ নির্মাণ করে । এর টাওয়ার প্রায় ২৬ মিটার উচু এবং তখনকার সময়ে এটা সবচেয়ে উচু বিল্ডিং ছিল । সকাল বেলা এসব এলাকার আশে পাশে ঘুরলাম । সেখানে লাঞ্চ, তারপর ছবি তুললাম কিছু । এরপর ২/৩ টা ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর, কনওয়ে, বিগবাইতে গেলাম। তাওয়াল, মোজা ও চকলেট কিনলাম কনওয়ে থেকে। পরে ৯৯ সেন্ট এর দোকান থেকে কয়েকটা জিনিষ কিনলাম ।

ব্রুকলিন ব্রিজ

নিউইয়র্কের দিনগুলোতে বেশ কয়েকবার ব্রুকলিন ব্রিজ পার হয়েছি। এটা পৃথিবীর প্রথম ষ্টীলের তৈরী সাসপেনশন ব্রিজ। ১৮৬৯ সালে এটা বানানো শুরু হয় ১৮৮৩ সালে এটার কাজ শেষ হয় । প্রায় ১০৯১ মিটার লম্বা এই ব্রিজটি তখনকার সময়ের একটা বিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং অগ্রগতির নিদর্শন। সকালে নাস্তা খেতে খেতে ১১ টা বেজে গেল আজ, বাইরে যাওয়ার প্লান আছে। সব গুছাতে গুছাতে ২ টা। তারপর ষ্ট্যাচু অব লিবারটি দেখার জন্য রওয়ানা হলাম । সাবওয়ে স্টেশন থেকে টিউবে সাউথ ফেরীতে

গেলাম। কাউন্টার থেকে লিবার্টি আইল্যান্ড এর টিকেট কাটা হলো । বড়দের জন্য ১১.৫০ ডলার বাচ্চাদের জন্য ৪.৫০ ডলার । প্রথম ফেরী মিস করলাম কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে পরবর্তী ফেরীতে উঠলাম । কিছুক্ষণ পরপরই জাহাজ আসছে । যাত্রির কমতি নেই । সারা বছর হাজার হাজার পর্যটক এই দ্বীপে আসছে স্বপ্নের আমেরিকার স্বাধীনতার প্রতীক দেখতে । বিভিন্ন দেশের যুবক, যুবতী, বৃদ্ধ ,বৃদ্ধা , শিশুদের ভীড়ে ফেরী এবং আশেপাশের এলাকা জমজমাট । কাউন্টার এলাকার আশেপাশে হকররা স্যুভেনিরের দোকান খুলে বসেছে । পর্যটকরা দেদারসে কিনছে যেসব স্মৃতি চিহ্ন । এখানে দাম একটু বেশী লিবার্টি আইল্যান্ড থেকে ।

জাহাজ থেকে ম্যানহাটানের সুউচ্চ ভবন গুলোতে সূর্যের আলোর প্রতিফলন অসম্ভব সুন্দর লাগে । বাড়ীগুলোর বাইরের নানা রং এর কাঁচ এবং বিভিন্ন আকার একটা চমৎকার দৃশের সৃষ্টি করছে । সবার ক্যামেরা ক্লিক করছে। সাদা কালো কোন ভেদাভেদ নেই এখানে, তবে কালো পর্যটকদের সংখ্যা কম, ইউরোপিয় এবং স্পেনিশ বংশদভুত লোকজন বেশী, এশিয় পর্যটক সীমিত । ফেরী তিন তলা। জাহাজে অনেক ছবি তোলা হলো। ১০/১৫ মিনিটের ভিতর দ্বীপে পৌঁছে গেলাম। ষ্টাচু অব লিবার্টি দেখার জন্য , লিবার্টি , আইল্যান্ডে নামলাম।

লিবার্টি আইল্যান্ড

ছবি তুললাম কিছু, সূর্য বড় বড় আকাশছোয়া বাড়ীগুলোর উপর পড়ছে। দ্বীপে ছবি তুললাম, তারপর ঘুরলাম এক চক্কর । ম্যাকডোনাল্ডস থেকে বার্গার কেনা হয়েছিল, সেগুলো পেপসি দিয়ে খেলাম সবাই মিলে। দিনের আলোছিল তখনো। ফেরীতে করে কিছুক্ষণ পরপরই একেকটা পর্যটকেরদল নামছে এর জেটিতে আবার আরেকদল ফিরে যাচ্ছে । দ্বীপটা মানুষে গমগম করছে । তবে খোলামেলা ও বিশাল ফাঁকা এলাকা । সব সময় আমেরিকা বলতেই এই ষ্টাচু অব লিবার্টির ছবি। বিশাল এই মুর্তিটাই দ্বীপের অন্যতম আকর্ষণ এতে চড়ার জন্য এবং এর কাছে দাঁড়িয়ে ছবি তোলার জন্য মানুষ ব্যস্ত । পর্যটকদের জন্য পার্কের মত ব্যবস্থা আছে সেখানে বসে খাওয়া দাওয়া করা যায় । ফেরীটাও সুন্দর খোলা ডেকে চেয়ার লাগানো আছে। অকৃপন সূর্যের আলোতে ভিজে নিউইয়র্ক শহর দেখতে দেখতে দ্বীপে পৌঁছানো যায়। খোলামেলা বলে দুর থেকে ছবি তোলার বেশ ভাল সুযোগ আছে । বেশ কিছুদুর হেঁটে লিবার্টি মুর্তির সামনে যেতে হয় । এর

চারদিকে রাস্তা ভূমি থেকে বেশ উচুতে । টিকেট করে এর ভেতরে উঠার ব্যবস্থা আছে। আমরা সেখানে যাইনি । বাইরে বসে ছবি তুলেছি ও আশেপাশের প্রকৃতি দেখে সময় কাটিয়েছি। ফ্রান্স থেকে আসা এক পর্যটকের সাথে দেখা হলো , প্রথম বারের মত এসেছে নিউইয়র্ক এ এই মূর্তি ফ্রেঞ্চ সরকার দিয়েছিল তাই দেখতে এসেছে । আমেরিকাতে বন্ধুর বাসায় থেকে কয়েকটা দিন কাটাবে। ঠান্ডা বাতাস, সূর্যের আলো , নির্মল পরিবেশ সব মিলিয়ে আমাদের কয়েক ঘন্টার অবস্থান বেশ আনন্দঘন ছিল। বাচ্চারা লিবার্টি আইল্যান্ড থেকে ফিরে এসে ব্যাটারী পার্ক এর কাছে বিশাল ষাড়ের পিতলের মূর্তির পাশে অনেক ছবি তুলল ও খেলাধুলা করল। লিবার্টি আইল্যান্ডে ফেরার সময় দেখলাম যে একটা সাবওয়ে বন্ধ হয়ে গেছে । তখন অন্য সাবওয়ে দিয়ে বাসায় ফেরার জন্য ট্রেন ধরতে গেলাম । গাড়ীটা একটা সাবওয়ে ষ্টেশন এর পাশে রাখা। ২ বার ট্রেন চেঞ্জ করতে হলো । গাড়ীটা নিরাপদে আছে কোন সমস্যা নেই । তারপর মার্কেট থেকে জিনিষপত্র কেনাকাটা করে রাত ৯-৩০ এ বাসায় এলাম ।

নিউইয়র্ক প্রবাসী অনেক বাংগালী খুব সরল জীবন যাপন করে অর্থ সঞ্চয় করে দেশে কিছু একটা করার চেষ্টা করেন। এদের কষ্টার্জিত অর্থে আমাদের দেশ অনেক উপকৃত হয়। আমি এদের সম্মান করি । আমেরিকাতেও তাঁরা বাংলাদেশের মতই সরল জীবন যাপন করেন। পরদিন নতুন ২/৩ টা ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোরে গেলাম কিছু মজার চকলেট কিনলাম । দুপুর বেলা পার্কে বসে কিছু সময় কাটালাম ।

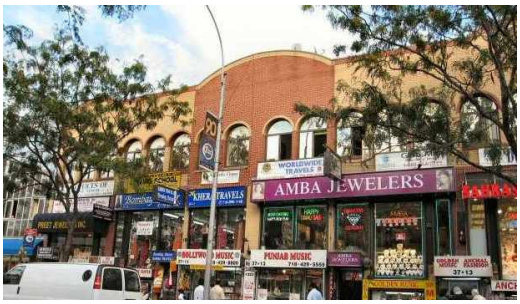

জ্যাকসন হাইট

নামাজ পড়লাম জ্যাকসনহাইটের এক মসজিদে, অযুও সেখানে করলাম । জ্যাকসন হাইটের আশেপাশে কুইন্স এলাকায় বহু বাংগালী থাকে । এসব জায়গায় বাংলা লিখা দোকানের সাইন বোর্ড ও বাংলা হরদম শোনা যায় । দোকান গুলোতে অনেক বাংলাদেশী জিনিষ ও স্থানীয় বাংলা পোষ্টার পাওয়া যায় । একদিন দেখলাম একজন বয়স্ক লোক ফুটপাতে একটা মেশিন দিয়ে পাতা পরিস্কার করছে এবং আরো কয়েকদিন দেখলাম সে এই এলাকায় মেশিন নিয়ে এ কাজ করে । পরে জানতে পারলাম ভদ্রলোক গ্রীস থেকে যৌবনকালে নিউইয়র্কে এসেছিলেন খালি হাতে । জীবন সংগ্রামে তিনি আজ প্রতিষ্ঠিত, তার দু ছেলে

ইঞ্জিনিয়ার। এখন স্বামী স্ত্রী একসাথে নিজেদের বাড়ীতে থাকে । সাথের দোকানটা তার , কাজের ফাঁকে ফাঁকে নিজ বাড়ী ও দোকানের আসেপাশের এলাকা নিয়মিত পরিছন্ন করে রাখেন ।

পরদিন সকালবেলা ছোটভাইয়ের অফিসের আশেপাশে ঘুরলাম । এইটথ অ্যাভিনিউ ৩৬ স্ট্রীট। টিউব ষ্টেশন হলো ৩৪ স্ট্রীট ষ্টেশন। সেখান থেকে হেঁটে যেতে হয় অফিসে। এরপর মেট্রোতে চড়ে লোয়ার ম্যানহাটানে গেলাম। এলাকাটা তুলনামুলকভাবে একটু দরিদ্রদের বলে মনে হলো । দুপুরে খাবার জন্য ম্যাগডোনাল্ডস এ ঢুকলাম। এখানে একটা মিল নিলে কোক যত ইচ্ছা তত খাওয়া যায়। তবে দুই গ্লাসের বেশী খাওয়া সম্ভব হলো না। পাশের নদী ও কাছাকাছি এলাকা গুলো কাঁচের ওপাশ থেকে দেখতে দেখতে আস্তে আস্তে লাঞ্চ সারলাম। এরপর বিশাল এক লাইব্রেরীর সামনে দাড়ালাম, দরজার বাইরে অনেই বই। বইগুলোতে বিভিন্ন মানের ডিসকাউন্টের ট্যাগ লাগানো, এই রাস্তার আরো বেশ কয়েক জায়গায় ফুটপাথে পুরানো ও নতুন বই রয়েছে । নিউইয়র্কে বইয়ের এ ধরনের এলাকা পেয়ে ভালই লাগল। লাইব্রেরীর ভেতর কয়েক তলা, পড়ার জন্য টেবিল আছে, সেলফ থেকে একটা বই নিয়ে যতক্ষন খুশী পড়ে রেখে দেয়া যায় কিংবা কিনতে চাইলে কাউন্টারে পেমেন্টের ব্যবস্থা আছে ।

বিকেলে ছোটভাইয়ের সাথে বের হলাম । কম্পিউটারের দোকানে ল্যাপটপ দেখলাম । তেমন সুবিধাজনক দামে পেলাম না। এরপর ৪২ নং ষ্টেশন থেকে ৪৭-৫০ রকফেলার প্লাজায় গেলাম। আন্ডার গ্রাউন্ডে ক্যানাডিয়ান এম্বেসী, ১২৫১ নং রুমে। সেখানে কানাডা যাওয়ার নিয়ম কানুন ও টাকা পয়সা জমার তথ্য নিয়ে এলাম।

সেন্ট্রাল পার্ক মনুমেন্ট

সকালে নাস্তা করে সাবওয়ে দিয়ে সেন্ট্রাল পার্কে যাওয়ার জন্য কলম্বাস সার্কেলে গেলাম । সেন্ট্রাল পার্ক এলাকাতে অনেক লোক বসে আছে। এটা ফিফথ ও এইটথ এভিনিউর মধ্যস্থ এলাকা এবং ৫৯ স্ট্রীট থেকে ১১০ স্ট্রীট অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত। ৫৯ স্ট্রীট ও এইটথ এভিনিউ ঢোকার মুখে সুন্দর একটা মনুমেন্ট আছে। এটা ব্যাটেলশীপ মেহনীর নিহত বীরদের স্মরনে নির্মান করা হয়েছে । এর নীচে বহু পর্যটক বসে দুদন্ড বিশ্রাম নেয়। নিউইয়র্ক শহরের ম্যানহাটানের অবস্থিত সেন্ট্রাল পার্ক একটা পাবলিক পার্ক । ৮৪৩ একর এলাকা জুড়ে এর অবস্থান । ১৮৫৭ সালে এটা জনসাধারণের জন্য খুলে দেয়া হয় এবং ১৮৭৩ সালে এর বিভিন্ন

কাজকর্ম শেষ হয় । অনেকগুলো সাবওয়ে ষ্টেশন থেকে সেন্ট্রাল পার্কে যাওয়া যায় এবং সেন্ট্রাল পার্কে ঘোরাফেরা শেষে অন্য আরেকটা সাবওয়ে ষ্টেশন থেকে নিজ গন্তব্যে ফেরা যায় । কলম্বাস সার্কেলে নেমে কিংবা ১১০ ষ্ট্রীট কিংবা পার্ক নর্থ ষ্টেশন থেকেও সেন্ট্রাল পার্কে যাওয়া যায় । সারা বছর এটা খোলা থাকে এবং বৎসরে ২৫ মিলিয়ন ভ্রমনকারী এখানে বেড়াতে আসে । সেন্ট্রাল পার্কের সবুজ ঘাসে ছাওয়া এলাকার মাঝে মাঝে কৃত্রিম লেকের মত আছে । একটা বড় লেকের নাম জ্যাকুলিন ওনাসিস রিজারভায়ার (জন এফ কেনেডি ও এরিষ্টটল ওনাসিস এর স্ত্রীর নামে)। কোন কাজ না থাকলে সকাল বেলা সেন্ট্রাল পার্কে চলে যেতাম, সাথে থাকত পানির বোতল ও হাতব্যাগে স্যান্ডুইচ। কিছুক্ষন ঘোরাফেরার পর পার্কের বেঞ্চে বসে বিশ্রাম নিতাম, মাঝে মাঝে ছবিও তুলেছি, সারা বছর পার্কের কোন না কোন রক্ষনাবেক্ষনের কাজ চলছে । বহু লোক শুয়ে আছে ঘাসে, অনেক যুগল নিরিবিলিতে গল্প গুজব করছে । পার্কে বেশ কয়েকদিন গেলাম । তবে এখানে সবাই ব্যক্তি সচেতন কেউ কাউকে ডিসটাব করে না । তাই কারোর সাথেই কথা হলো না । মাঝে মাঝে পথচারীকে দু একটা জায়গার নাম জিজ্ঞাসা করে বোবা ভাবটা কাটাতাম।

তারপর ছোট ভাইয়ের অফিস এলাম। ম্যাকডোনাল্ড থেকে ১.৬১ ডলারে পেপসি খেলাম ও ফ্রেস হলাম । পৌনে পাঁচটপা পর্যন্ত সেখানে ছিলাম। ছোট ভাই তখনও বের হয়নি । ট্রেনে করে রুজভেল্ট ষ্টেশন এ নেমে পাউরুটি, ফুলকপি ও সসেজ কিনলাম । সন্ধ্যায় বাচ্চাদের নিয়ে পার্কে গেলাম ওরা দৌড়াদৌড়ি করল । রাতে ছোট ভাই কানাডার ভিসার কাগজ পত্র রেডি করলো । ইনভাইটেশন, সলভেন্সি সার্টিফিকেট এবং পারমানেন্ট রেসিডেন্স কার্ড এর কপি নিলাম ।

পরদিন সকালে ছোট ভাইকে ট্রেনে তুলে দিলাম । ২৪ ডলারে কেনা আনলিমিটেড টিকেট দিয়ে অনেক ঘোরা হচ্ছে। এরপর কানাডিয়ান এম্বেসীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। অনেক চেকিং এর পর ভিতরে বসলাম। ৬৫ ডলার জমা দিলাম কাউন্টারে। তারপর ইন্টারভিউ। আমার কাগজপত্র দিলাম। বেশ কয়েকটা প্রশ্ন করল তারপর পাসপোর্ট জমা নিয়ে দুপুর ১-৩০ এ আসতে বলল । সময় মত এম্ব্যাসিতে গেলাম। এক মাসের ভিসা পেলাম,সিংগল এ্যান্ট্রি । এরপর আন্ডার গ্রাউন্ডে করে কিংসওয়ে ষ্টেশনে এলাম এটা ব্রুকলিন এলাকায়। কিছু কেনাকাটি করলাম এখানে। অনেক দুরের রাস্তা ২/৩ বার ট্রেন পরিবর্তন করে ছোট ভাইয়ের অফিসে আসতে আসতে বিকেল ৫-১০ বেজে গেল। ছোট ভাইকে পেলাম না, পরে আমি একা বাসায় এলাম। রাতে গাড়ীতে ছোট ভাইয়ের সাথে বাজারে গেলাম রাত ১২-৩০ এ বাসায় এলাম অনেক বাজার নিয়ে। রাতে পিচ ফল খেলাম, ভাল লাগল। আজকে নিউইয়র্ক এর দুটো বরো বা এলাকা ব্রুকলিন ও ম্যানহাটন দেখা হলো ভালই লাগল ।

সকালে ছোট ভাইকে ট্রেনে তুলে দিয়ে বাসায় এসে ঘুম দিলাম । ১১ টাতে উঠে নাস্তা করে বের হলাম ফিফর্থ এভিনিউতে গেলাম এয়ার মরক এর অফিসে । টিকেট চেঞ্চ করলাম । ফিফর্থ এভিনিউ অসম্ভব সুন্দর । বিশাল চকচকে বিল্ডিং ও অনেক সুন্দর ডিজাইনের বাড়ী তবে এটা অফিস এলাকা । দুপুরে ট্রেনে করে সেন্ট্রালপার্কে এলাম। সেখানে পৌনে ৪ টা পর্যন্ত বসে ছিলাম। তারপর দুই ভাই মিলে একসাথে বাসায় এলাম । রাতে বাচ্চাদেরকে নিয়ে বাসার আশে পাশে হাঁটলাম কিছুক্ষণ ।

প্রতিদিন সকাল বেলা বাচ্চাদেরকে স্কুলে দিয়ে ফিরে আসার সময় কুইস এলাকার বিভিন্ন জায়গাগুলো ঘুরে দেখতাম । বিশাল এই দেশটাতে এবং এই শহরে সবকিছু ফাকা ফাকা করে বানানো এবং বিশাল আকারের সব জিনিষপত্র। স্কুল থেকে বাসায় ফেরার পথে একটা আন্ডার পাস আছে, নীচে ট্রেন লাইন, উপরে থেকে নীচে তাকালে জায়গাটা কেমন যেন অন্য রকম লাগত । উপরে ঘরবাড়ি ও চলমান জীবন নীচে গাছপালা এবং নির্জন অপরিচিত দৃশ্য মনে হতো ওটা অন্যজগত ।

এখানে মানুষজন অনেক বই কেনে এবং পথে ঘাটে বসে কিংবা দাড়িয়ে ট্রেনে বা সাবওয়েতে অনেকের হাতে বই দেখা যায় । বই পড়ার পর বইগুলো এরা কাছের বিনে ফেলে দেয়। বিনে অনেক বই দেখলাম প্রায় নতুন সবগুলো বাসায় নেই তাই ফেলে চলে যায়। জ্যাকসনহাইট সাবওয়ে ষ্টেশন থেকে বাসায় আসার পথে এক বাসার সামনে বড় একটা কার্টুনে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগজিন দেখলাম। কপিগুলো একদম নতুন একবার পড়ার পর বাসার সীমানার বাইরে রেখেছে । কেউ নিলে নিতে পারে নইলে গার্বেজে চলে যাবে । ময়লা আবর্জনা ফেলার ব্যবস্থাও উন্নত, সব ধরনের ময়লা একই কার্টুনে ফেলার নিয়ম নেই । কাগজ জাতীয়, কাঁচ কিংবা অন্যান্য ময়লা ফেলার আলাদা আলাদা পলিব্যাগ পাওয়া যায় সেগুলোতে ময়লা ভরে বাসার বাইরে নিদির্ষ্ট জায়গায় রাখতে হয় । অন্যথা হলো জরিমানার ব্যবস্থাও আছে। এখানে এক বৃদ্ধাকে দেখলাম বোতল সংগ্রহ করছে জানলাম এগুলো সে জমিয়ে পরে বিক্রি করে। গরীব লোক এদেশেও আছে ।

সবাই মিলে বেড়াতে বের হলে মাঝে মাঝে গ্যাস নিতে হতো । ফুয়েলকে এরা গ্যাস বলে, কয়েকটা গ্যাস ষ্টেশন ফাঁকা, দু একটা গাড়ী মাঝে মাঝে আসছে গ্যাস নিয়ে চলে যাচ্ছে । আবার একই রকম ষ্টেশনে অনেক গাড়ীর ভিড়, ছোট ভাই তার গাড়ীটাকে সুবিধামত একটাতে ঢোকাতে চাচ্ছে তবে খালি ষ্টেশনে যাচ্ছে না,পরে হেসে আমাকে মূল্যের বোর্ডের দিকে তাকাতে বলল । দেখলাম ভিড়ের জায়গা গুলোতে যে তেলের দাম ৩.৯৯ ডলার সেখানে খালি পাম্পগুলোতে তা ৪.৯৯ কিংবা ৪.৫০ ডলার । কি সুন্দর ব্যবস্থা । টাকা থাকলে শান্তিতে চলে যাও নইলে আমজনতার লাইনে দাড়িয়ে তেল ভরে নাও । জীবন এখানে বেশ হিসাব করে বুদ্ধি খাটিয়ে যাপন করতে হয় । আবেগ দিয়ে এখানে চলেনা।

চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থাও অনেকটা এ ধরনের, সবার জন্য যেসব পার্ক বা চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা সেগুলো সাবওয়ে থেকে হাঁটাপথের দুরত্বে এখানে আমজনতা ভিড় করে আনন্দ করে সবাই খুশী, তবে টাকাওয়ালাদের জন্য আরো দুরে নিজের গাড়ীতে চড়ে পরিছন্ন বিনোদনের বহু ব্যবস্থা আছে । এখানে আমজনতা ভীড় নেই সামর্থ্যবানদের সমাগম সেখানে। সুন্দর ভাবে নিজস্ব প্রাইভেসী ও বিনোদন এরা নিশ্চিত করেছে টাকার মানদন্ডে । এগুলোও নতুন অভিজ্ঞতা আমার কাছে। সবাই অফিসে ও স্কুলে চলে গেলে এলাকাটা প্রায় ফাঁকা হয়ে যেত । তখনো ছায়া ছায়া ভাব থাকত বলে বাসার আশপাশে ঘোরার সময় ছোট ছোট বাচ্চা ও বড়ো বুড়িদের দেখা যেত । পাশেই চাইনিজদের বাসার ছোট ৩/৪ বছরের ছেলে ও তার দাদী কিংবা নানী । হেসে হ্যালো বলত । বাচ্চাও কোলে আসতে চাইত । তবে বিনা অনুমতিতে অন্যের বাচ্চা কোলে নেয়া বা আদর করা অপরাধ । বিনা আমন্ত্রনে অচেনা বাসায় যাওয়া অপরাধ, তাই এসব আবেগ সংযত করে চলতাম । এদেশী লাইসেন্স ছাড়াও গাড়িতে উঠলে ধরা পড়লে ফাইন এবং কাউকে সাহায্য করতে গিয়ে কোন অঘটন ঘটলে দায়দায়িত্ব সেই চালকের । একবার এক বৃদ্ধা তার পার্কিং সময় শেষ হচ্ছে বলে গাড়ীটা আমাকে সরিয়ে দিতে বলল আমি সরি বলে চলে এলাম কারণ এই মহিলাই কোন সমস্যা হলে আমার বিরুদ্ধে কেইস করে দেবে। বিদেশে উপকার করে ঝামেলায় জড়াতে কে চায় ।

সেঞ্চুরী ২১

পরদিন শুক্রবার ২৩ সেপ্টেম্বর ১১ টার দিকে নাস্তা খেয়ে বাইরে গেলাম । আজ ম্যানহাটনে গেলাম । প্রথমে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ষ্টেশনে গেলাম সেখান থেকে রেক্টর ষ্ট্রীট , টাইমস্ স্কয়ার, ফুলটন ষ্ট্রীট ইত্যাদি সব জায়গায় ১২ টা থেকে ৩ টা পর্যন্ত ঘুরলাম । ২টা বড় ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর সেঞ্চুরী ২১ ও সায়ামে গেলাম। ডাউন টাউন ম্যানহাটন এ বিশাল চার্চ আছে । ছবি তোলা হলো না কারণ আমি একা ছিলাম তা ছাড়া ছবি তোলার নিয়ম কানুন জানিনা যদি আবার ক্যামেরা নিয়ে যায় । আলকায়দা ও টেররিষ্ট আতংক আমেরিকার সর্বত্র বিরাজমান।

ব্যাটারী পার্কে

গ্রাউন্ড জিরো ও আশে পাশের এলাকা দেখে একটু বিরতি নিয়ে ব্যাটারী পার্কে এসে কিছুক্ষন বিশ্রাম নেয়া যায়। নিউ ইয়র্কের স্কাই ক্রাপারের অরন্যে ব্যাটারী পার্ক যেন মরুদ্যান । কলোনিয়াল সময়ে হারবার এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য একটা আর্টিলারী ব্যাটারী এখানে ছিল এবং সেই ব্যাটারীর নামে বর্তমানে পার্কের নাম ব্যাটারী পার্ক । ব্যাটারী পার্কে ক্যাসেল ক্লিনটন নামে একটা দুর্গ আছে যা ১৮০৮-১১ সালে নির্মাণ করা হয়েছিল । বর্তমানে এই দুর্গটা সামরিক কাজে ব্যবহার হয় না । এখানে এখন থিয়েটার ও অ্যাকুরিয়াম আছে এবং এটা নিউইয়র্কের ইতিহাস পর্যটকদের কাছে তুলে ধরে। পৌনে চারটার দিকে হাডসন নদীর পাড়ে ব্যাটারী পার্ক ও ওয়াগনার পার্ক এলাকায় কিছুক্ষণ বসলাম। ২০০১ সালে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের টুইন টাওয়ার টেররিষ্ট আক্রমনের ফলে ধ্বংস হয়ে যায় । বর্তমানে এই জায়গাটাকে গ্রাউড জিরো বলা হয় । এখানে সেই ধবংসের পর আবার নতুন সৃষ্টির অপেক্ষায় রয়েছে নিউ ইয়র্ক বাসী। সাবওয়েতে ওয়ার্ল্ড ট্রেড ষ্টেশনে নেমে গ্রাউড জিরোতে যাওয়া যায়।

দুপুর বেলা বার্গার কিং এ ৫ ডলার দিয়ে বার্গার ও কোক খেলাম। বার্গার কিংএ বসে ছিলাম কিছুক্ষণ । ৪-৩০ এ ছোট ভাইয়ের অফিসে এলাম । সেখান থেকে শো পিছ কেনার জন্য গেলাম । তারপর ট্রেনে করে লেক্সিংটন এভিনিউতে এলাম। পরে ট্রেন বদল করে এইটি সিক্সথ ষ্ট্রীটের সার্কিট সিটিমলে গেলাম । সেখানে ডিজিটাল ক্যামকর্ডার ও ক্যামেরা কিনে রাত আটটায় বাসায় এলাম ।

কনি আইল্যান্ড

পরদিন শনিবার বিকেলে সী বীচ গেলাম, ছুটির দিন। নিউইয়র্কের এই বীচ আটলান্টিকের পাড়ে। মোটকথা আটলান্টিক মহাসাগর আল্লাহতায়ালা আফ্রিকা ও আমেরিকা মহাদেশ থেকে দেখার সৌভাগ্য দিলেন । অনেকদুর হেঁটে সাগর পাড়ে যেতে হয়। রাস্তা থেকে সিড়ি দিয়ে নীচে নামার ব্যবস্থা আছে । তারপর বালুর উপর দিয়ে হেঁটে সাগর পারে, সাগর এখানে বেশ শান্ত কালচে নীল রং এর পরিস্কার পানি ,কেমন যেন অন্য রকম লাগে । সাগর পাড়ে বড় বড় বোল্ডার আছে, সেখানে ২/১ টা জুটি গভীর গল্পে মশগুল । বালুতে মেট বিছিয়ে সূর্যস্নান করছে কেউ কেউ। বাচ্চারা বালু দিয়ে শহর বাড়ীঘর বানাচ্ছে । লোকজন নেই তেমন। বিশাল দেশ আরো বিশাল তার এলাকা, সে তুলনায় মানুষ অনেক কম । প্রত্যেকে নিজেদের প্রাইভেসি নিয়ে আছে। কেউ কাউকে ডিসটার্ব করছে না । আমরাও সবাই মিলে মেট বিছিয়ে বসে গেলাম । বাসা থেকে খাবার দাবার ও ড্রিংকস আনা হয়েছে । সেগুলো সবাই মিলে মজা করে খেলাম । বীচ তেমন পরিস্কার মনে হলোনা । তবে আমরা আমাদের ময়লা গুলো প্যাকেট করে নিয়ে নিলাম । ব্রুকলিনের কনি আইল্যান্ডের কাছে এইটথ স্ট্রীট অ্যাকুরিয়াম এলাকাতে ছবি তুললাম। আটলান্টিকের পাড়ে এই জায়গাটা । আজ ঠান্ডা আবহাওয়া ছিল। বাচ্চারা সাথে লাগানো পার্কের রাইড গুলোতে চড়ল । ২ ডলার পার রাইড, ছোট ভাইয়ের গাড়ীতে করে গেলাম । সন্ধ্যায় মার্কেট থেকে কিছু জিনিষ পত্র কেনা হলো । রাতে গল্প গুজব করে সময় কাটল ।

ইউএন সদর দপ্তর

নিউইয়র্কে থাকাকালীন ইউএন সদর দপ্তরে বেড়ানোর ইচ্ছা ছিল । দুপুরে খেয়ে ইউএন সদর দপ্তরে গেলাম। গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল ষ্টেশনের কাছে ইউনাইটেড নেশনস এর সদর দপ্তর । আগেই একজন পরিচিত কর্মকর্তার অ্যাপয়েনমেন্ট করা ছিল, আমাকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। পরে ২ জন মিলে সব হলগুলো ঘুরে দেখলাম। নিরাপত্তা পরিষদ, জেনারেল এসেম্বলি, অছি পরিষদ ইত্যাদি। ছোট বেলায় বইতে এগুলো পড়েছিলাম, আজ নিজ চোখে এগুলো দেখলাম, বেশ আনন্দ লাগল। বিশাল ভবন, অনেক চেকিং এর ব্যবস্থা । বহু ইউ এন গার্ড এর নিরাপত্তার দায়িত্বে। বাইরে ইউ এন এর সমস্ত সদস্য দেশের পতাকা উড়ছে । আমার দেশের পতাকা দেখে মনটা গর্বে ভরে উঠল । ইউএন সদর

দপ্তর থেকে বের হয়ে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন অফিসে গেলাম সেখানে কিছুক্ষণ ছিলাম। এরা বেশ কাজ করছে। বাংলাদেশর সুনাম ও ইউ এনে বাংলাদেশীদের চাকুরীর জন্য। সেখান থেকে মেট্রোতে করে ছোট ভাইয়ের অফিস। আজ বৃষ্টি ছিল । ইহুদীদের দোকান বি এন্ড এইচ থেকে ক্যামেরা কিনলাম। রাতে ল্যাপটপ আনতে নতুন জায়গাতে গেলাম । বাসায় এনে ল্যাপটপ টা চালু করলাম । এর পেছনে অনেক সময় চলে গেল।

আজ মঙ্গলবার, নিউইয়র্ক ছেড়ে যাব আজ । সকালে ঘুম থেকে দেরীতেই উঠলাম । দুপুরে আমি আগে খেয়ে নিলাম । বিকেল চারটায় পুরা ফ্যামিলি নিয়ে গাড়ীতে রওয়ানা হলাম । বিকাল পাঁচ টায় জে এফ কে এয়ারপোর্টে পৌঁছালাম। মালামাল জমা দিয়ে বোর্ডিং কার্ড নিলাম । এরপর টার্মিনাল-১ ঘুরে দেখলাম সবাই মিলে। ২ তলায় কফি সপ এর কাছে কাঁচ ঘেরা রুমে বসে রানওয়ে দেখছিলাম আর স্মৃতিচারণ করছিলাম । দুই ভাইয়ের এক সাথে প্রবাসে ১৪ দিন থাকার সৌভাগ্য আগে কখনো হয়নি। কত স্মৃতি কত কথা এক জীবনের। ছোটভাইয়ের দুই ছেলে খেলায় ব্যস্ত। ছোটজন কালে। ৬ টায় ইমিগ্রেশনে গেলাম । সব চেক করল । পেছনে ফিরে সবাইকে বিদায় জানালাম। সবাই দেখছে আমাকে, আস্তে আস্তে জনারন্যের বাঁকে চলে এলাম, পেছনে ছোট ভাই ও পরিবার , আর আমি ফিরে যাচ্ছি আমার কর্মস্থলে। আবিদজানে, কাসাব্লাংকা হয়ে। এর মাঝে চলে গেল ১৪ টা দিন। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলাম এ বিশাল ভূখন্ড ভ্রমনে ও অবস্থানের তৌফিক দেয়ার জন্য ও শোকর করলাম আল্লাহর দেয়া রহমতের। আমেরিকা মহাদেশ দেখার সখটা পুরণ হলো এবার। বাংলাদেশী অনেক মানুষের কাছে আমেরিকাকে স্বপ্নের দেশ মনে হয় । প্রাচুর্যের আকর্ষণ আমাদের সবাইকে সেখানে টানে । চাকচিক্যের পেছনে যে কি শ্রম আছে তা নিজ চোখে না দেখলে কখনো বোঝা যায় না । মানুষ যন্ত্রের মত কাজ করছে । যা পাচ্ছে তা থেকে ট্যাক্স, প্রিমিয়াম ইত্যাদি কাটার পর সামান্যই থাকছে। আমেরিকার মানুষ যে খুব সুখী এটা ঠিক না। তবুও তো তারা আমেরিকান। এক ডলার আমাদের কাছে আশী টাকা । অসম্ভম পরিশ্রমের জীবন যাপন করে প্রবাসীরা । তবে কাজের সুযোগ থাকায় সবাই কিছু না কিছু কাজ পায়, বেকার থাকে না। তাই একবার গেলে কেউ আর দেশের বেকারত্বের কথা চিন্তা করে ফিরে আসে না । জীবন যাত্রা বেশ সাজানো তবে ফুলেও পোকা থাকে তাই এখানেও যে জীবন একদম নির্ভেজাল তা কিন্তু না। নিরাপত্তাহীনতা ,বিষাদ যে কোন সময় আসতে পারে , তার উপর কালো চামড়ার এশীয় দুর থেকেই চেনা যায়। নিউইয়র্ক শহরে অবশ্য এই ধরণের সমস্যা নেই । মোটামুটি ইমিগ্রেন্ট দিয়ে ভরা এই শহর, তবে শ্বেতাংগ প্রধান অনেক শহরে এখনো কালো বা বিদেশীরা অবাঞ্চিত । মুখে বলে না ভাবে বুঝা যায়। অনেক সাধারণ মানুষ আমেরিকায় এসে সংগ্রাম করে

আজ প্রতিষ্ঠিত । আবার অনেকে জীবন সংগ্রামে কোন রকম টিকে আছে । এটাই জীবন। পৃথিবীর সব দেশেই তাই।

ইচ্ছে ছিল ইষ্টকোষ্ট থেকে ওয়েষ্টকোষ্টে গ্রে হাউন্ড বাসে করে যাব। এবারের অবস্থানে ছুটির টানাটানি ও অন্যান্য কারণে তা হলো না । তাছাড়া সবচেয়ে আকর্ষণীয় নায়াগ্রা ফলস দেখা ও কানাডা ভ্রমণ মিস করলাম। আলাহ যা করেন তা ভালর জন্য। নিশ্চয়ই এতে অনেক ভাল রয়েছে । প্লেন সময় মত ছাড়ল । রয়েল এয়ার মরক এর বোয়িং ৭৬৭-৩০০ সুপরিসর বিমানে করে ফিরে চললাম কাসাব্লাংকার উদ্দেশ্যে । ১৬ ডি আমার সিট । ৩ টা সিটই খালি । শুয়ে বসে ঘুমিয়ে সময় কাটল । বিমানে নাস্তা ও ডিনার সার্ভ করল বিমানবালা । বিদায় নিউইয়র্ক, আশা আছে ভবিষ্যতে কোনদিন উত্তর গোলার্ধের এই দেশগুলো আরো বিশদ দেখা হবে ইনশায়ালাহ।

shovonshams@yahoo.com